আশোকনগরের হয়ে ওঠা আশ্রয়ে স্মৃতিযাপন

সত্য গুহ

কাতারে কাতারে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসছে নিপীড়িত লাঞ্ছিত নিঃস্ব নরনারী শিশুবৃদ্ধ যুবাদের দল। স্টেশনে, নদীঘাটে, হাঁটাপথে জলা জঙ্গলে উজিয়ে আসা ভারত সীমান্তের গাঁগঞ্জের ইস্কুল বাড়িতে শুধু মানুষ আর মানুষ। কে কাকে কোথায় আশ্রয় দেবে? এখনো কিছু গুছিয়ে-উঠতে না-পারা নতুন ভারত সরকারই অসহায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রিফিউজি সামলাতে ল্যাজে গোবরে। এর মধ্যে 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়' বিশ্বাসী বেআইনি বামপন্থী রাজনৈতিক দল এক দিকে সরকারকে বিপাকে ফেলতে এবং অন্য দিকে দলকে সংগঠিত করতে রেফিউজিদের পুঁজি করতে লেগে পড়েছে। তাদের গান সংগঠনের মাধ্যমে জোরদার উদ্বাস্তু আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে নিঃস্ব বাস্তুহারাদের সকল রকম অন্যায়কেই, সহানুভূতিচ্ছলে, জেনেবুঝে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে। ফলে আশ্রয়তল্লাসী মানুষেরা, যে সব রাজনৈতিক দল 'আজাদী' এসেছে বলে বিশ্বাসী, তাদের ও 'আজাদী ঝুটা' বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ মদতে রাত্রির অন্ধকারে পরের জমিজমা হা রে রে রে করে দল বেঁধে জবরদখল করে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে এবং এক বিঘৎ জমির জন্য মারামারি কাটাকাটি করেছে নিজেদের মধ্যে। কাজিয়া-বিবাদ মেটাতে সালিসী করতে এসেছে যেখানে যে রাজনৈতিক দলের প্রভাব বেশি, সেই দলের নেতারাই। সরকারও এ ঘটনাকে, ঝামেলা না বাড়াতে চেয়ে, উদাসীন উপেক্ষার চোখে দেখে রাশ টেনে রেখেছে পুলিশ প্রশাসনের। এভাবেই তৈরি হয়েছে বাঘাযতীন কলোনি, সূর্য সেন কলোনি, নেতাজী নগর কলোনি, নাগতলা কলোনি, যাদবপুরের আশপাশের কলোনিগুলোর মতো পশ্চিমবঙ্গ ভরে অজস্র জবর-দখল কলোনি। এই জবর-দখল কারণে ভরাট হয়ে গেছে বহু বহুতর জলাবিল জলাশয়, মুছে গেছে পতিত অঞ্চলের জঙ্গল যেমন, তেমনি ইঁট কাঠ লোহা ও সিমেন্ট - বালির জঙ্গলে পরিণত হয়েছে ফসল বুকে ধানী মাঠ। না হোক পরচা দলিল পাওয়া পোক্ত আশ্রয়স্থল, শেষ তো হোলো আশ্রয়শিবিরে বসবাস।

কত আশ্রয়প্রার্থী এসেছিলো একদা গায়ে গায়ে থাকা হিন্দু-মোছলেমের স্নিগ্ধ পূর্ববঙ্গের ধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যাবার পর? "১৯৪৮ সালের ২৪শে অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকায় পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্বীকার করেন প্রতিদিনই হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসছেন। তাঁর হিসেব, এপর্যন্ত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ১৫ লক্ষ, কংগ্রেস নেতা সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিসাবে ওই সংখ্যা ২০ লক্ষ। কিন্তু জ্যোতি বসুর আত্মজীবনীতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশভাগের পরপরই ৩৫ লক্ষ নরনারী পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। পরবর্তী কালে আরো কয়েক দফায় উদ্বাস্তু আসায় সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো ৭০ লক্ষতে।" (থিরবিজুরি, দেশভাগ সংখ্যা ২০০৩, স্বাধীনোত্তর বাংলা আত্মকথায় দেশ ভাগ, অপূর্ব সাহা)। পরে ১৯৫২ সাল অব্দি কত সংখ্যক উদ্বাস্তু যে পঞ্জীভূক্ত এবং পঞ্জীর বাইরে তার যথার্থ কোনো সেনসাস রিপোর্ট আছে বলে জানা নেই।

তবে, এই সর্বস্ব ও সম্মানহারা আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দেবার জন্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও তাঁর সরকারে সদর্থক প্রয়াস এবং সম্ভব-অসম্ভব পরিকল্পনার অন্ত ছিলো না। এজন্যে তিনি দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের কেষ্ট-বিষ্টুদের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া

করতেও কসুর করেননি। তিনি উদ্বাস্তুদের পাঠাতে চেয়েছেন দণ্ডকারণ্যে — আন্দামানের বিস্তীর্ণ এলাকায় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে। বাঙালিরা বাংলা ছেড়ে কোথাও যেতে চায়নি। সামান্য কিছু অবশ্য গেছে এবং তাদের একটা অংশ আবার ফিরেও এসেছে। তিনি বাংলা-বিহার সংযুক্তিতে সম্মত হয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ-সিংহের সঙ্গে সহমত পোষণ করে। কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আগ্নেয় রোষের কাছে নতি স্বীকার করে তাঁকে এ পরিকল্পনা বর্জন করতে হয়েছে। তিনি কেবল উদ্বাস্তুদের জন্যেই পত্তনি দিয়েছেন কল্যানী শহরের আর পত্তনি দিয়েছেন আমেরিকানদের ফেলে যাওয়া দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধকালের পতিত অ্যারোড্রম হাবড়া কন্টোল বিল্ডিংয়ে 'হাবড়া আর্বান কলোনীর', তিনি গঙ্গা থেকে পাম্প করে বালি আনিয়ে ভরাট করেছেন উদ্বাস্তুদেরই আশ্রয় দেবার জন্যে উল্টোডাঙ্গা লাগোয়া বিস্তীর্ণ জলাভূমি — গড়ে তুলেছেন 'সল্টলেক' শহরতলি শহর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেবলমাত্র 'হাবড়া আর্বান কলোনি' ও তার পার্শ্ববর্তী উদ্বাস্তু কলোনিগুলো ছাড়া আর কোনো কলোনি শহরই কেবল বাস্তুহারাদের জন্যেই শহর বা গ্রাম থাকেনি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একেবারে নতুন ধরনের শহর গড়ার পরিকল্পনায় গড়ে তুলতে চেয়ে পত্তনী দিয়েছেন হাবড়া আর্বান কলোনির। তিনি চেয়েছিলেন, এ এমন শহর হবে, যেখানে কেবল শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই বসবাস করবে, যারা মোটামুটি সঙ্গতিসম্পন্ন অর্থাৎ বছরে আড়াইশো করে টাকা কিস্তিতে দিয়ে কুড়ি হাজার টাকায় একই রকমের গড়নের ৫/৬ কাঠার জমির ওপর তৈরি বাড়ি কিনে নিতে পারে এবং পূর্ববঙ্গীয় উজ্জ্বল শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারে এবং করতে পারে ক্রমবিকশিত। এই চিন্তা মাথায় আসতেই তিনি উপযুক্ত জমি খুঁজতে শুরু করেন এবং তাঁর নজরে আসে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ কালে চিরবিদায়ী ইংরেজ ভারত সরকারের আমেরিকান মিত্রশক্তিকে যুদ্ধ বিমান তৈরী করতে দেবার জন্যে দেওয়া এই অবিকৃত অঞ্চলটি। যেমন তা নজরে আসে তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে জমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে নিয়ে নেবার ছক কষে ফেলা। ১৯৪৮-এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এসেছেন বনগাঁ সীমান্তের রেফিউজিদের দুরবস্থা নিজের চোখে সরজমিনে দেখতে। যাবার পথে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা পুঁথি পড়ানোর মতো ক'রে পড়ালেন ও ফেরার পথে অঞ্চলটিকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে আবেগপ্রবণ জওহরলালের মৌখিক সম্মতি আদায় করে নিলেন এবং দ্রুত সরকারি নিয়ম-নীতির কাজ শেষ করে শুরু করে দিলেন শহর গড়ার কাজ।

সরল সোজা, এক সঙ্গে চারখানা বিমান আকাশে উড়াল দিতে পারে এমন চওড়া টানা রাস্তা। সাপ, খরগোশ, শেয়ালের আস্তানা, লম্বালম্বা কাশের বন, গাছ বলতে বাবলা গাছ, কাঁটা গাছের ঝোপ, বুনো ফুলের বন, আর তার মধ্যে আমেরিকান সৈন্যবহরের জন্যে বিশাল বিশাল ফেলে যাওয়া ভ্যান ও যুদ্ধসামগ্রী, মাঝখানে বিমান ওঠানামা নিয়ন্ত্রক এক এবং অদ্বিতীয় কন্টোল বিল্ডিং, হিজলি, মোমিনপুর, বাইগাছি, শেরপুর, কাঁকপুল পার্শ্ববর্তী মৌজার স্থানীয় লোকেরা ঐ নামেই পরিচিত করতো অঞ্চলটাকে। সরকারি অভিধা 'হাবড়া আর্বান কলোনী'।

রাম জন্মানোর আগেই রামায়ণ নাকি লেখা হয়েছিলো। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের 'হাবড়া আর্বান কলোনি' শুরুর আগেই তিনি তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বাস্তব জীবনের রসদ ও মেধা-মানসের চর্চাচর্যার সুযোগ করে দেবার জন্যে গড়ে তুলেছিলেন একদিকে সুবিস্তৃত গ্রামাঞ্চল — উদ্বাস্তুদের কৃষি, পশুপালন, ছোট ব্যবসা ইত্যাদির জন্যে গ্রাম — কল্যাণগড়, হরিপুর, কালীতলা, নয়াসমাজ প্রভৃতি। অন্যদিকে পুরো শিক্ষাকেই ভিত্তি করে শিক্ষাঞ্চল বাণীপুর। যেখানে প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়েছিলো বেশ কয়েকটি গান্ধী-শিক্ষা-চেতনানুসারি রবীন্দ্র-শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন বিশ্বভারতীর আদলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। আমরা অনুচ্ছেদ শুরুতে যে প্রবচনটি দিয়েছি, তার বদলে যদি বলি শিশু জন্মানোর আগেই তার জীবনের সমস্ত রসদ, খাদ্য-স্বাস্থ্য-মেধার বিকল্পহীন রসদ মজুত থাকে মাতৃতন্ত্যে, তবেই বিষয়টি জুৎসই হয়। এক দিকে পূর্ববঙ্গের তাবৎ অঞ্চলের লোক সংস্কৃতি - কর্মসংস্কৃতি নিয়ে বলিষ্ঠ গ্রামচেতনা, অন্যদিকে চর্চিত চর্যিত পরিশীলিত শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা। এই দুই পশ্চাৎভূমি (হিন্টার ল্যান্ড) — মাঝখানে প্রকৃতমানব- বিদ্যানুশীলকারী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে তোলার বাসনায় গড়তে চাওয়া 'হাবড়া আর্বান কলোনি' একটা সুসজ্জিত পরিকল্পনা মাফিক 'আশ্রয়'।

যথা সময়ে যথা নিয়মে দেশের নামীদামী বাস্তুকার সংস্থাকে বরাত দিয়ে নগর গড়ার কাজ শুরু হোলো। চওড়া কংক্রিটের রাস্তাগুলো ভেঙে সংক্ষিপ্ত করে মাটি বের করে তাতে কিছু বাড়ি তৈরি হোলো কংক্রিটের রাস্তা ভাঙা সিমেন্টলাগানো আধলা ইঁট ও মেটে মিহি বালি দিয়ে। কই মাছের তেল দিয়ে কই মাছ ভাজা আর কী। তবু ছ'কাঠা জমির ওপর একতলা পাকা বাড়ি। একদিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাড়ি অ্যালট করা হচ্ছে, অন্যদিকে

“ চওড়া কংক্রিটের রাস্তাগুলো ভেঙে সংক্ষিপ্ত করে মাটি বের করে তাতে কিছু বাড়ি তৈরি হোলো কংক্রিটের রাস্তা ভাঙা সিমেন্ট লাগানো আধলা ইঁট ও মেটে মিহি বালি দিয়ে। কই মাছের তেল দিয়ে কই মাছ ভাজা আর কী। ”

সার সার বাড়ি তৈরি হচ্ছে। তখন এখানকার লোকজন বলতে কনস্টাকশন বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার ওভারশিয়ার কেরানি কর্মচারী আর কনট্রাকটরদের লোকজন, কুলি-কামিন মজুর রাজমিস্ত্রি। কন্টাক্টরদের কাজ করার জন্য কিছু উদ্বাস্তুও এখান সেখান থেকে এসে জুটে গিয়েছিলো। দু-চার টাকায় দিন মজুরি করে একগুচ্ছের পেট চালাতো। আর এই এদের আশ্রয় হয়েছিলো মিলিটারি পরিত্যক্ত দশাসই ভ্যানগুলো। শুরুর মাস দুই পরে সরকার স্রেফ অ্যালোটি দেখানোর জন্য নানা আশ্রয় শিবির থেকে পরিবার পিছু দশটাকা নিয়ে অ্যালটমেন্ট দিয়ে কয়েকটি তৈরি বাড়িতে লোক ঢোকালো। এরাই এখানকার আদি উদ্বাস্তু বাসিন্দা। কিন্তু আড়াই শ'টাকা ট্রেজারিতে জমা দিয়ে অ্যালটমেন্ট পেয়ে যিনি প্রথম হাবড়া আর্বান কলোনিতে পা রেখেছিলেন এবং সত্যিকারের আশ্রয় পেয়েছেন, তিনি একজন শিক্ষক — প্রয়াত মতিলাল সরখেল। নির্মিয়মান নগরে পা রেখে চারদিকে তাকিয়ে তিনি হয়তো অনাগত অ্যালোটিদের উদ্দেশ্যে মনে মনে বলে থাকবেন 'এসো এসো', এখানে তোমরা তুমুল শীত, রংচটা রোদ, আর বেতাল ঝড়ঝাপটা ছাড়া, অন্য কোনো শত্তুর পাবে না। পাবে উদার আকাশ, উজ্জ্বল রোদ, আলোর অধিক সেই অন্ধকার আর নির্মল নির্জনতা।

এরপর সময় দৌড়েছে। একে একে জ্বলে উঠেছে দেউটি। জুটেছে হাজার হাজার পরিবারের 'আশ্রয়'। ঝড়ে বিধ্বস্ত পাখি নীড় ফিরে পেলে যে স্বস্তি আনন্দে অবশিত হয়, নতুন নীড়ের খড়-কুটোর গন্ধে যেমন গান গেয়ে ওঠে, তেমনি আনন্দের আভা দেখা দিয়েছে নিত্য আসা অ্যালোটিদের মধ্যে। সেদিন অভাব ছিলো অনন্ত কিন্তু উত্তরণের প্রয়াস ছিলো দুরন্ত। কেউ নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকতে চায়নি, চেয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানুষ হতে। এই নতুন শহরে, এমন কোনো ঘর ছিলো না, যে ঘরে ছিলো না অন্তত একজন গ্রাজুয়েট। সেদিন প্রথম ঢলে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের কেউ শিক্ষক, কেউ অধ্যাপক, কেউ ডাক্তার, কেউ বাস্তুকার, কেউ সংগীত বিশারদ, কেউ চিত্রশিল্পী, কেউবা উঁচু সরকারি কর্মচারী, কেউবা আইন ব্যবসায়ী আর কোনো কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামী। এক কথায় বলা যায় প্রায় প্রত্যেকেই বুদ্ধিবাদী সারস্বত সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সবার নাম করতে গেলে অসম্পূর্ণ সেনসাস তালিকা হয়ে যাবে। এদের ঘরের প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্ররা কলকাতায় থেকে অসীম দারিদ্র্য-চিহ্ন শরীরে বহন করে কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়েছেন, কেউবা পড়েছেন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে সবার চেনা তেমন একটা নাম করাই যেতে পারে — ডাঃ সাধন সেন।

গোটা পূর্ব বাংলার জেলা-উপজেলা মহকুমা থানা তালুক থেকেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে অ্যালটি হয়ে এসেছেন গর্বিত মানুষজন, সিলেট, চাটগাঁ, নোয়াখালি, রাজসাহি, ময়মনসিংহ, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ বরিসাল, ফরিদপুর, বাগেরহাট, খুলনা, যশোর — কোন অঞ্চলের না? সব অঞ্চলেরই লোকজন তাঁদের আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও আঞ্চলিক টানাটোন ধীরদ্রুত সবরক্ষেপ বজায় রাখা আঞ্চলিক বাংলা ভাষা নিয়ে তিন ফুট দূরত্বের জোড়া জোড়া সার সার বাড়িগুলোতে বসবাস করেছে। আর এসেই একটা মিশ্র আত্মীয়তা তৈরি করতে শুরু করেছে। মিশ্র আত্মীয়তা? সে আবার কী? ধরা যাক, একবাড়ির কর্তা সামনের কর্তাকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করেন, গিন্নী তাঁর স্ত্রীকে ডাকেন মাসিমা বলে; ছেলে মেয়েরা ঐ কর্তাকে ডাকেন জামাই বাবু, গিন্নীকে ডাকেন বৌদি, কর্তার ভাই ঐ কর্তাকে ডাকে 'কাকু' এবং গিন্নীকে ডাকে পিসিমা বলে। তা হলে সম্পর্কটা কী দাঁড়ালো? একেই বলা হোলো মিশ্র আত্মীয়তা। এমনি ভাবে এখানে তৈরি হয়েছে একটা শক্তিশালী 'মিশ্র বাংলাভাষা'। পশ্চিমবঙ্গে সাধু চলতি ভাষাকে ভিত্তিতে রেখে কথোপকথনের মৌখিক ভাষায় বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দ ও প্রকাশের আঞ্চলিক ঢঙ ও স্বরক্ষেপন ভঙ্গী মিলে মিশে গেছে। "খাল্লীফুজা হিতের রাইতে দেখতি হইলে, অ্যালায়, জব্বর কুট গায় না চড়ালে ভোগবা হ্যানে, এই কইয়্যা থুইলাম। হ্যাসে ব্যারামে পড়লে মোরে দুস দিতি পারবে না কইলাম।" এই মিশ্রণ পরে বৈবাহিক সূত্রে রক্তেও ঘটেছে, কিন্তু এখানে কোনো প্রকৃত অর্থে সমাজ গড়ে উঠতে পারেনি। আর তার কারণ রাজনৈতিক বিভাজন। গোড়া থেকে রাজনীতিটাই নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে এখানকার মানুষের হয়ে ওঠার প্রায় সমস্ত প্রয়াস।

আগেই বলা হয়েছে, এখানে অভাব ছিলো অনন্ত। জীবন যাপনের জন্যে যা প্রয়োজন, তার কিছুই ছিলো না এখানে, হাটবাজার, দোকান, স্কুল, ডাকঘর, পরিবহন ব্যবস্থা, রেল স্টেশন, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সুস্থ রেশন ব্যবস্থা কিছুই ছিলো না — থাকবার কথাও ছিলো না। বাজার ছিলো কল্যাণগড়ে — একটু সস্তায় জিনিস পেতে হলে কেনাকাটা করতে যেতে হোতো হাবড়ায়। ডাকঘর ছিলো মাইল তিনেক দূরে ট্যাবাবাড়িয়ায়। রেশনে চালগমচিনি আসতো অনিয়মিত। কোনো একটা বাড়ি থেকে এক পক্ষ দেড় পক্ষে একবার অথবা মাসে একবার রেশনে মুঠি মাপে রেশন দেয়া হোতো এবং তা তোলার জন্যে সারা রাত জেগে ছেলেপুলেরা লাইন দিয়ে থাকতো। আগে ভাগে রেশন তুলতে না পারলে পাছে ফুরিয়ে যায়, এই ভয়। পরিবহনের জন্যে ছিলো মাত্র গুটি কয়েক রিক্শ। কলকাতা যাবার জন্যে ট্রেন ধরতে যেতে হোতো হাবড়া স্টেশনে। আর সক্ষম পুরুষেরা যারা বাইরে চাকরি বাকরি করতেন, তাঁরা সাত সকালে পায়ে হেঁটে হাবড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতেন এবং রাত আটটা ন'টা নাগাদ কলকাতা বা হাবড়া থেকে চাল ডাল তেল নুন মাছ সব্জি কেরোসিন এমন কি কয়লাও কিনে ঘরে ফিরতেন। খুব বেশি মালপত্র থাকলে রিক্শ করে ফিরতেন। ভাড়া ছিলো বারো আনা।

একেবারে শূন্য থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিলো এই নতুন 'আশ্রয়'-প্রাপ্ত মানুষের জীবনে। আগেই বলা আছে, অভাব যতই বিষদাঁত বাগিয়েছে, প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা হয়েছে মানুষের তীব্রতর, হয়েওঠার প্রয়াস হয়েছে দুরন্ত। বসতি পাবার পরে পরেই কল্যাণগড় নামকরণ ক'রে রুরাল বেল্টের মানুষেরা যেমন রুজিরোজগারের চেষ্টায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন, তেমনি

পূর্ববঙ্গীয় সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য টিকিয়ে রেখে কালের সঙ্গে তাল দিয়ে উন্নয়ন অধ্যয়ন ভিত্তিক শিক্ষাদীক্ষার দীপ্ত হতে চেয়েছেন। যোগেশ দত্ত, নলিনী দাশগুপ্ত, ক্ষিতীশ দাস, কান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, নরেন দত্ত, অমিয় সেন প্রমুখ ব্যক্তিত্বর আত্মত্যাগ করে যে সমাজ সেবা, তা ভোলবার নয়। তারাই প্রথম এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন বালক বালিকাদের জন্য দু'টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় — কল্যাণগড় বিদ্যামন্দির ও কল্যাণগড় বালিকা বিদ্যালয়। সন্তোষ কুমার দে এবং অন্যান্যরা গড়েছেন সেবাসমিতি। আর দ্বিজেশ চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত সরকার প্রমুখ যুবারা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অন্যান্য বিষয় চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন হরিপুর সংস্কৃতি সংঘ। সরকার তরফ থেকে স্থাপন করা হয়েছিলো কয়েকটি প্রাথমিক স্কুল এবং তার জন্যে সক্রিয় উদ্যোগও নিয়েছিলো স্থানীয় মানুষই। হরিপুর, কল্যাণগড়, কয়াডাঙ্গার সেদিনকার বৈশিষ্ট্যই পূর্ববঙ্গীয় সংস্কৃতির লৌকিক ধারাটিকে বজায় রাখা। তাই তাঁদের নিয়ত উদ্যোগ থেকেছে যাত্রাপালা, রয়ানির গান মঞ্চস্থ করায়। প্রখ্যাত যাত্রাশিল্পী, পালাকার ও নির্দেশক সূর্য দত্ত-র নিবাস ছিলো এখানেই। বরিশালের বিখ্যাত নট্টরা দলগুদ্ধ আশ্রয় পেয়েছেন এখানেই। এখানেই অনন্ত দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন স্বনামধন্য ঢোলবাদক ক্ষিরোদ নট্ট। এই নীরব সাধককে ঐতিহ্যচিহ্ন হিসেবে আবিষ্কার ক'রে প্রকাশ্যে আনা হল তাঁর জীবনের শেষবেলায়। এখানে গোটা শ্রাবণ মাস জুড়ে ঘরে ঘরে যেমন পাঠ হয় মনসামঙ্গল আর তার সুরে মথিত হয় আকাশ। উদ্যোগ প্রয়াস এবং জনসংযোগের জন্যে স্থানীয় সুধীসমাজ প্রকাশ করেছে 'গ্রামের কথা','কৃপান', 'উত্তর ২৪ পরগণা বার্তা' নামের পত্রিকা আর সাহিত্য সেবার জন্যে এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'ব্যঞ্জনবর্ণ', 'ধৃতি'-র মতো সাহিত্য পত্রিকা। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্যে আছে 'সহৃদ সংঘের' বিশিষ্ট ভূমিকা। প্রথম প্রজন্মের পর দ্বিতীয় প্রজন্মের গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়চৌধুরী, জহর সেনগুপ্ত, সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত, তপন বিশ্বাস, স্বদেশ মুন্সী, মলয় ব্যানার্জী, মনীষ ব্যানার্জী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব শিল্প সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি ব্যাপারে মন ও মনন সঁপে নিজস্ব 'আশ্রয়'-কে বিশিষ্ট এবং সমুন্নত করে তুলেছেন। কালের পরিবর্তনে কল্যাণগড়ের লোকায়ত ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বাধ্যত কিছুটা বিলুপ্ত হলেও তার রেশটি এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। কল্যাণগড় বাজারের 'নাটমন্দিরে' এখনো বসে হরিনাম সংকীর্তনের আসর।

১৯৪৮-এ গড়ে ওঠা পরিকল্পিত পাকা কোঠাবাড়িতে দশটাকা জমা দিয়ে আসা প্রেমচাঁদ ঘোষ প্রমুখ উদ্বাস্তুরা ছাড়া ট্রেজারিতে ২৫০ টাকা জমা দিয়ে ১৯৪৯-৫০-এ যাঁরা পাকা আশ্রয় পেয়ে আর্বান কলোনিতে এসেছিলেন— গাঙ মরে তো স্রোত মরে না — তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই ছিলো মধ্যবিত্তসুলভ একটা উচ্চমন্যতা বোধ। এঁদের কেউ না কেউ কলকাতা বা শহরতলীর কোনো না কোনো স্থানে চাকুরি করতেন। বেশির ভাগই ছিলো ডেইলি প্যাসেঞ্জার, সকাল ৬টা সাড়ে ৬টায় বেরিয়ে রাত নটা সাড়ে নটা বা ১১টা ১১-৩০-এ ঘরে ফিরতেন। অনেকেই আবার ছিলেন হপ্তাবাবু। সাত দিনে একদিন — শনিবার রাতে সপ্তাহের বাজার করে আশ্রয়ে ফিরতেন। এঁদের কারো কারো বাইরে থেকে টাকা আসতো, কিন্তু জমানো টাকাও ছিলো কারো, তাই অনেক অভাবের যুগেও অনেকেরই কষ্টটা খুব বেশি করে বাজেনি। যাঁরা নয়া শহরেই থাকতেন, তাঁদের ছিলো অখণ্ড অবকাশ, যে অবকাশ তাঁদের স্মৃতি নিয়ে আক্ষেপ করার এবং নিজ নিজ অহমিকাকে চেখে চেখে উপভোগ করার। ফলে, যাকে বলে প্রত্যেক পরিবারে সঙ্গে পড়শীপনা ভাব বজায় রেখে সামাজিক ঐক্য, তা এ আর্বান কলোনিতে কখনো গড়ে উঠতে পারেনি। সব সময়েই বজায় থেকেছে একটা ইগোর লড়াই। এমনিক নগরের নামকরণ 'অশোকনগর' করতে গিয়েও লড়াই জমে উঠেছিলো অমূল্য চ্যাটার্জী, কেদার ভট্টাচার্য, ডাঃ শীতল বসু প্রমুখ প্রাচীনদের সঙ্গে নব্যপন্থী ননী কর, রমেশ দাস, চিত্ত রায়, কালু ভট্টাচার্য্য প্রমুখর।

যাঁরা এসেছিলেন এই নতুন কলোনীতে প্রথম দিকে, তাঁদের শ্রেণিচিহ্ন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি মুখ্য নাম উল্লেখ করলেই স্পষ্ট হবে এঁদের সাংস্কৃতিক অবস্থান। ১৯৪৮-৫০-এর দিকে এখানে এসেছেন বহু বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করা সমুচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত প্রয়াত শ্রদ্ধেয় নিশিকান্ত সেন, সুশিক্ষক নলিনী মোহন কর, প্রধান শিক্ষক মতিলাল সরখেল, শ্রদ্ধেয় সুরেন তালুকদার, ডাক্তার বিজন বিহারী ভট্টাচার্য্য, শ্রদ্ধেয় জ্যোৎস্নাকুমার দাশগুপ্ত, বিনয় চক্রবর্তী, প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী গঙ্গাপদ আচার্য প্রমুখ ব্যক্তিত্ব যাঁদের নাম এই নতুন শহরের ব্লু-প্রিন্টে সুচিহ্নিত। এর পরে যাঁরা এসেছেন — কেউ হয়তো আগেই এসেছেন — তাঁদের নাম ইতিহাসের গুরুত্বের দিক থেকেই এখানে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। এঁরা হলেন নরেশ চন্দ্র কর, নলিনী কান্ত গুহ, জ্যোতিষ গুপ্ত, অনঙ্গমোহন দাম, শুশীল কুমার সেন, রায়সাহেব সুরেন মুখার্জী, রায় সাহেব শ্রীশ ঘোষ, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, সতীশ সাহা, মুকুন্দ চক্রবর্তী, সুখময় রায়, গনেশ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক হৃদয়রঞ্জন দাস, অধ্যাপক তারেন্দ্রচরণ ভট্টাচার্য্য, রাধাকান্ত দে, অমূল্য চ্যাটার্জী, সতীশ ভৌমিক, উপেন নাহা, সন্তোষ চক্রবর্তী, উমাপদ মিত্র, সরোজ বসু, বিনোদ বিহারী ব্যানার্জী, করুণা মজুমদার, ঐতিহাসিক বঙ্কিম রায়চৌধুরী, অধ্যাপিকা মীরা দত্তগুপ্তা, জ্ঞানদা প্রসাদ চৌধুরী, শতদল রায় প্রমুখ।

সঙ্গে সঙ্গেই এবং আগে পরে যুবা কিশোর যাঁরা পাদপ্রদীপের আলোয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজকর্মে ও রাজনীতির ক্ষেত্রে চিহ্নিত হয়েছেন, তাঁদের নামগুলো এখানেই উল্লেখ করতে হয়। এঁরা হলেন ননী কর, রমেশ দাশ, পুষ্প চাটার্জী, সন্তোষ কুমার সেন, ডাক্তার সাধন সেন, চিত্র শিল্পী মনি চন্দ, কেশব ভট্টাচার্য্য, বাদল চ্যাটার্জী, সত্য গুহ, কানু ভট্টাচার্য্য, মনি পাল, ফণি পাল, ফণি সেন, অনিল ঘোষ, কমল রায়, বাসন্তী দাশগুপ্তা, সুবর্ণা আচার্য, অজিত বসু, স্বদেশ রায়, লীলা দাস, বকুল গুহঠাকুরতা, বাণী সেন, লীলা সেন, সুব্রত সাহা, অবনী চন্দ, প্রতাপকুমার চন্দরায় (দুলু), সমর ঘোষ, অরুণ দাস, চিত্ত রায়, উমাপদ মিত্র, রাণী বসু (বিরল), বেনু দাশগুপ্ত, অজিত

দোবে, পবিত্র দাশগুপ্ত (কানু), অজয় দাশগুপ্ত (দয়াল), জীবন সাহা, বরুণ রায়, দীপ্তীশ মহাজন, মীরা কাঞ্জিলাল, সুতপেশ দাশ, সুরথেশ দাশ, দেবপ্রসাদ সেন, শংকর সেন, প্রবোধ ব্যানার্জী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

এই সব নাম এবং তাঁদের শিক্ষাদীক্ষার পরিচয় নিলে দেখা যাবে, অন্য কোন স্থান থেকে যেন বটবৃক্ষ ক্রেন দিয়ে তুলে এনে শোভা বর্ধনের জন্যে রোপন করা হয়েছে। সামান্য উনিশ-বিশ হলেও প্রায় একই ছাঁচে ঢালাই করা— কেউ কারুর থেকে কম যান না। নেহাতই '৪৭-এর কোপ, তাই ঠাঁটবাট প্রভাব, প্রতিপত্তি সব খুইয়ে, একের মনোভাব, অন্যের গা ঘেঁসে থাকতে হয়েছে — অভিধা নিতে হয়েছে রিফিউজি এবং একই ধাঁচের বাড়িতে ছ'কাঠা জমি আগলে থাকতে হচ্ছে। এমনি আক্ষেপ নিয়েই মরমে মরে থেকে যে যেখানে যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন তাতেই প্রভাবশালী হয়ে উঠতে চেয়েছেন, নিজেকে যেখানে চাপিয়ে দিতে পারেন নি, অনুগতদের নিয়ে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছেন বা হয়েছেন।

তবে ওপরে যে সব শ্রদ্ধেয়জনদের নাম করা হয়েছে, ভিত্তি পর্বে এঁদের অনেকেই এখানে আসেন নি বা এলেও নগরচিন্তায় খুব একটা চিন্তিত থাকেন নি বা অনেককে সক্রিয় হতে দেখা যায় নি। এ সময়ে বয়স্করা নীতিগত তত্ত্বগত দিক থেকে — দাবীদাওয়ার ফর্দ তৈরি করার জন্যে তৈরি করেন 'নাগরিক সংঘ'। কিন্তু সেদিনের যাঁরা যুবা-কিশোর সেই ননী কর, কানু ভট্টাচার্য্য, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখ নানা ব্যাপারে বয়স্কদের প্রতিবাদী হয়ে যেমন 'নাগরিক পরিষদ' করতে মনস্থ করেন, তেমনি নিজেদের শরীর মনের চর্চার জন্যে গড়ে তোলেন 'যুব সংঘ'। এই যুব সংঘ থেকেই যাত্রা শুরু সংস্থাগত ভাবে শরীর মন মেধা চর্চার। স্থাপিত হয় 'অভ্যুদয় পাঠাগার'। এ বাড়ি সে বাড়ি থেকে সংগৃহিত কয়েকখানা ছেঁড়াখোঁড়া বই তার সম্বল। সত্য গুহ তার গ্রন্থাগারিক। মূলত তাঁর উদ্যোগেই 'আর্বান' কলোনিতে প্রথম প্রকাশিত হয় 'অভ্যুদয়' নামে হাতে লেখা একটি দেয়াল পত্রিকা এবং যুগান্তরের ছোটদের পাততাড়ির সদস্য আগে থেকেই থাকা তাঁর প্রচেষ্টায় এবং ননী কর, সুবর্ণা আচার্য, বাসন্তী দাশগুপ্ত, বকুল গুহঠাকুরতা, অনিল ঘোষ-এর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'রক্তরবি সব পেয়েছির আসর'— শিশুদের জন্যে প্রতিষ্ঠান। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হন কমল রায় (ভানু দা) এবং তাঁর ভাই মানু — চৌখশ নাগরিকানায় তাঁরা এসেই সহজে সবার মন কাড়েন এবং ধীরে ধীরে 'রক্তরবি' মধ্য গগনে উঠতে থাকে।

অশোকনগরের শুরু থেকেই এখানে নাট্যচর্চা ও অভিনয়ের সূত্রপাত হয়। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সন্তোষকুমার দে ছিলেন সংস্কৃতি প্রেমী। তাঁর উৎসাহে প্রথম অভিনীত পৌরাণিক-ঐতিহাসিক দু'একটি নাটক, জ্যোতীশ গুপ্ত, অবনী চন্দ, রমেশ দাশ, পুষ্প চাটার্জী, সত্য রায় প্রমুখ উৎসাহীরা অংশ নেয় মঞ্চ বেঁধে। অশোকনগরে নাট্যচিন্তা, নাট্য নির্দেশনা, অভিনয় ইত্যাদিতে পরপ্রজন্মের প্রত্যাপকুমার চন্দরায় (দুলু চন্দ) ই একটা গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তাঁর নির্দেশনায় অভ্যুদ পাঠাগারের প্রযোজনায় ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'ধৃতরাষ্ট্র' এবং অন্য আরো দু'একটি নাটক অভিনীত হবার পর গঠিত হয় 'ঐক্যতান নাট্য সংস্থা'। এ সংস্থার সূচনা অবশ্য 'ধৃতরাষ্ট্র' অভিনয়ের কাল থেকেই। ১৯৬০-এ ঐক্যতান মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতা অবলম্বনে সত্য গুহ রচিত 'দুই বিঘা জমি' নাটকটি। এটিই প্রথম ম্যানুস্ক্রিপট থেকে নাটক। এ নাটকের অভূতপূর্ব মঞ্চ সাফল্য 'ঐক্যতান'কে রবীন্দ্র শতবর্ষে তার 'রক্তকরবী' নাটকটি মঞ্চস্থ করতে উৎসাহিত করে এবং দুঃসাহসী নির্দেশক অভিনেতা দুলু চন্দ প্রমাণ করে দেয় অশোকনগরের 'ঐক্যতান' রক্তকরবীর ব্যাপারে অন্তত 'বহুরূপী'-র সমস্পর্ধী। রবীন্দ্র শতবর্ষে দুলু চন্দর নির্দেশনা এবং ছাত্র ফেডারেশনের কালচারাল ইউনিটের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' ও 'অচলায়তন'। দীপ্তিশ মহাজন উদয়াচল কাব-এর প্রযোজনায় তাঁর নাট্যরূপ দেয়া 'পুরাতনভত্য' এবং 'বিসর্জন' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এর আগে অভ্যুদয় পাঠাগার উমাপদ মিত্রের উদ্যোগে উৎসাহে তৈরি করে 'পূর্ণিমা সম্মেলন'। কলকাতা থেকে নর্তক শম্ভু ভট্টাচার্য্য, ক্ষিতীশ বসু প্রমুখ যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসতেন, তেমনি পূর্ণিমা সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন ক্ষিরোদ নট্ট, ধ্রুপদী সঙ্গীত গায়ক সতীশ ভৌমিক প্রমুখ ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে আসতেন প্রফুল্ল হোড় রায়, বিমল দাশগুপ্তর মতো বিদ্বজ্জনেরা বাণীপুর থেকে। পরবর্তী অধ্যায়ে নাট্যকার কমল সেন শিশির বাগচীরা তৈরি করেছেন 'মৈনাক নাট্যগোষ্ঠা' এবং এঁরা বেশ কিছু নাটক মঞ্চস্থ করে। পরে বহুনাট্য দল হয়ে উঠেছে অশোকনগরে। নিয়মিত হয়ে আসছে নাট্যচর্চা। ধারাবাহিক ভাবে তৈরি হয়েছে স্ক্রিপ্টএবং তা মঞ্চস্থ হয়েছে সফল ভাবে। 'অন্বিক্ষা' নাট্যসংস্থা গড়ে তুলে নট-নাট্যকার-নাট্যশিক্ষক সমীর কুণ্ডু যেমন নিয়ত পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি অধুনা নাটক নিয়ে দুঃসাহসী পদক্ষেপ নিচ্ছে 'অশোকনগর অন্বেষা', 'নাট্যমুখ' 'সবুজ' প্রভৃতি নাট্যদলগুলো। অশোকনগরের নাটকের দল হয়েছে অনেক আর এই নাট্য আন্দোলনে জড়িয়ে আছেন অশোকনগর - কল্যাণগড়ের বয়স্ক ব্যক্তিত্ব স্বদেশ মুন্সী এবং নাটককে নিয়ত উৎসাহ দিতে আছে 'অভিযাত্রী' নামের সংস্থা। তারা প্রতিবছর নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে শীতকাল ডেকে আনে।

অশোকনগর কোনো দিক থেকেই 'আশ্রয়' পাবার পর আর পিছিয়ে থাকতে জানে না। আমরা নাটক সম্পর্কে অল্পের মধ্যে একটু বেশিই আলোচনা করে ফেললাম। সাহিত্যে, সাংবাদিকতায়, ক্রীড়াজগতে, চিকিৎসা বিদ্যায়, বিজ্ঞানে, বাস্তু বিদ্যায়, এমন কি সাম্প্রতিকতম তথ্যপ্রযুক্তি বিদ্যায়ও স্থানীয় যুবারা বিশেষভাবে কৃতী। আর সেজন্যে অশোনকগর তার প্রাথমিক দূরদর্শী জ্ঞানী অভিভাবকদের প্রতি নতজানু। তাঁরা, সুবুদ্ধি অভিভাবকরা, সেদিন বুঝেছিলেন, নিঃস্ব তাঁদের পরপ্রজন্মের কাছে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার কোনো পুঁজিই থাকবে না। পুঁজি হতে পারে মাত্র প্রথাগত শিক্ষার শংসাপত্র তথা সার্টিফিকেট। আর সে

জন্যেই নিশিকান্ত সেন, নলিনী মোহন কর, ননী কর, সন্তোষ কুমার সেন প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা, কল্যাণগড়ে বালকদের জন্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বলে অশোকনগরে 'বাণীপীঠ' নামে বালিকা বিদ্যালয়ই প্রথমে স্থাপন যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। পরে স্থাপন করে ছিলেন অশোকনগর বয়েজ সেকেণ্ডারি স্কুল। পরবর্তী কালে বহুবহু স্কুল তৈরি হয়েছে অসিত দাশগুপ্ত, নরেশচন্দ্র কর, কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ শিক্ষানুরাগীর মাধ্যমে। তার ফলে অশোকনগর সৃষ্টি করতে পেরেছে কৃতী সব ছাত্র যাঁরা এক্ষণে পৃথিবীর কোনো কোনো এবং নিজভূমে প্রতিভা বিচ্ছুরণ করে 'আশ্রয়'য়ের ঠিকানা ঘোষণা করছে — 'অশোকনগর'।

সূচনা থেকেই অশোকনগরের বাতাসে ভেসেছে সঙ্গীতের সুর। গঙ্গাপদ আচার্য, সতীশ ভৌমিক, সুকৃতি সেন, মাধব গোস্বামী, মীরা কাঞ্জিলাল প্রমুখ যেমন, উচ্চাঙ্গ সংগীত, লঘু সংগীত, আধুনিক সংগীত ররীন্দ্র-নজরুল-অতুল প্রসাদ-দ্বিজেন্দ্র-রজনিকান্তর গান গেয়ে গানের ভুবন তৈরি করেছেন ব্যক্তিগত ভাবে, তেমনি 'পূবালী', (যার স্থায়ী সভাপতি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রাজরাজেশ্বরী সুচিত্রা মিত্র এবং শিক্ষক গোষ্ঠার অন্যতম রীণা মহাজন, প্রশান্ত চ্যাটার্জী প্রমুখ প্রণম্য সঙ্গীত শিক্ষকরা), 'মৌসুমী' শিক্ষায়তন, 'মহুয়া' (মহেন্দ্র মজুমদার পরিচালিত) 'মিউজিকাল ফোরাম' 'ছন্দবিতান', 'তবলা মহল' প্রভৃতি গীতি-বাদ্যচর্চা-শিক্ষাকেন্দ্রগুলো অশোকনগরকে ওকনো বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করেছে।

> ট্রেন ছুটছে 'ইন্ডিয়া'র কলিকাতার দিকে। তার শব্দ ধর্ষিতার মর্মান্তিক গোঙানি — তার গায়ে রক্তের ছোপ। আর সে যেখানে থামছে, সেখানে ঝড়ে ভাঙাডানা বিপর্যস্ত কাকের মতো থিক থিক করছে মাথা ...

চিত্রশিল্পচর্চা করতেন প্রাথমিক পর্বে মণি চন্দ। পরে অশোকনগরে ব্যাপকভাবে চিত্রশিল্পের প্রতি তরুণদের আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছেন অশোকনগরে প্রথম চিত্রকলায় ডিগ্রি পাওয়া শিল্পী প্রতাপ কুমার চন্দরায় ও বিশ্বরঞ্জন দে। তাঁদের ছাত্ররা বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন দুবে, দীপঙ্কর ঘোষ, দেবমিত্র চৌধুরী প্রমুখ বাংলায় কৃতী হিসেবেই চিহ্নিত।

খেলাধূলার ক্ষেত্রে অশোকনগর পিছিয়ে থাকেনি কখনো। বিভিন্ন কাব ও স্কুলের খেলাধূলার মধ্যে সমন্বয় আনার জন্যে ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্যে তৈরি হয়েছে অশোকনগর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। অশোকনগর বয়েজ সেকেণ্ডারি স্কুলই বস্তুত প্রায় সব কাবকে খেলোয়াড় সরবরাহ করেছে। সমস্ত রকম ক্রীড়ায় সুশিক্ষিত শিক্ষক সঞ্জীব রায়চৌধুরী নিষ্ঠার সঙ্গে তৈরি করেছেন খেলোয়াড় ও অ্যাথলিটদের। বারবার 'সুব্রত কাপ' খেলেছে তাঁর স্কুল। সমরেশ চৌধুরীর মতো আরো অনেক ফুটবলার ও ক্রিকেটার সৃষ্টি করেছে অশোকনগর। শিক্ষণ ব্যাপারে স্বাধীনতার মধ্যে ছাত্রদের সুশৃঙ্খল রেখেছেন বয়েজ সেকেণ্ডারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনস্বী সুশীল কুমার সেন যেমন, তেমনি সাহিত্য, সঙ্গীত, ক্রীড়া প্রভৃতির বেলাতেও বিজ্ঞানমনস্ক সুশীল কুমার সেন ছিলেন সমান মনোযোগী। আগামী প্রতিভার উন্মেষের আঁচ পেলেই তার স্ফুরণের জন্যে যা যতটুকু করা দরকার সাধ্যমতো তা করতে তিনি কখনো কৃপণ থাকেননি।

বহুবহু কথা বলার আছে এই 'আশ্রয়' অশোকনগরের ব্যাপারে। একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস অল্প কথায় বলা যায় না। কোনো 'আশ্রয়' একক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে না, তাতে থাকে অজস্র হাতের ছাপ এবং মেধার দ্যুতি। কিন্তু সবার নাম উল্লেখ করা যায় না। কেবল উদ্যোক্তাদের নামটুকুই উল্লেখ করা যায়। অশোকনগরকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় সুশীল কুমার সেন, প্রণব মজুমদার, শেখর মুখার্জী প্রমুখ। তাঁরা তৈরি করেছিলেন 'বিজ্ঞান সংস্থা' এবং তার মাধ্যমে চালিয়েছেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন। প্রণবেশ চক্রবর্তী, শ্যামল ভট্টাচার্য্যরা গড়ে তুলেছিলেন 'অশোকনগর সিনে কাব'। দেশ বিদেশের চলচ্চিত্র দেখিয়ে আধুনিক বিশ্বের মন ও মননের সঙ্গে উপযুক্তদের পরিচিত করাতে সচেষ্ট থেকেছেন তাঁরা। রাজশেখর রায়চৌধুরী, অপূর্ব সাহা, সৌমেন নিয়োগীরা স্থাপন করেছিলেন 'সায়েন্স অ্যাণ্ড সোসিও-কালচারাল ফোরাম'। এরা আর্সেনিক দূষণ-অধ্যুষিত অঞ্চলে সমীক্ষা চালান এবং সাধারণ মানুষকে অলৌকিকতার বিরুদ্ধে চালিত করতে সচেষ্ট হন।

মধ্যবিত্তদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সংবাদপত্র পাঠ। মধ্যবিত্ত যুক্তিবাদীদের শহর অশোকনগর। তাই প্রথম থেকেই — প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই এখানে প্রকাশিত হয়ে আসছে পাক্ষিক, মাসিক ত্রৈমাসিক পত্রপত্রিকা। ১৯৫১-তে অভ্যুদয়-এর দেয়াল পত্রিকা 'অভ্যুদয়'। তারপর ছাপানো পত্রিকা 'ঋতুপত্র'। তারপর একে একে প্রকাশিত হয়েছে সংবাদ ও সাহিত্য পত্রিকা — বিমল দাস-এর 'হাবড়া বার্তা', জীবন সাহা ও দীপক গুহর 'যুগবার্তা', কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'নয়াদুনিয়া' এবং অবনী ধরের 'অশোকনগর বার্তা'। মান-এর দিক থেকে সবকটি পত্রিকাই যথেষ্ট উন্নত ছিলো। তবে একমাত্র 'নয়াদুনিয়া' ছাড়া সবকটি পত্রিকাই ক্ষণজীবী। অনেক পরে 'ছন্দক', 'অশোক কল্যাণ''চব্বিশ পরগণা বার্তা', 'গ্রাম শহরের কথা,' 'যেথায় আমার ঘর' নামের কয়েকটি সংবাদ-সাহিত্যমূলক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য পত্র 'ঋতু পত্র'-র পর বিভিন্ন সময়ে

অশোকনগর থেকে প্রকাশিত হয়েছে অনেকগুলো সাময়িক পত্র বা লিট্‌ল ম্যাগাজিন। স্থানীয় নতুন লেখক ও বাইরের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা নিয়ে জাতে ও ধাতে আলাদা আলাদা চরিত্রের পত্রিকা এগুলো। স্বদেশ রায় ও বীরেন্দ্র নিয়োগী সম্পাদিত 'অন্বিষ্ট' বেরোয় রবীন্দ্র শতবর্ষে। তা-ই পরে 'যুগ অন্বিষ্ট' হিসেবে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে সুবোধ ভট্টাচার্য ও অন্যান্যদের সম্পাদনায় 'নহবত'। প্রথমে বছরখানেক 'ত্রৈমাসিক' থাকলেও এখন তা এক 'বার্ষিক পত্রিকা'। এক সময়ে প্রকাশিত হয়েছিলো দীপিকা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবেদন'। একে একে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে অপূর্ব সাহার সম্পাদনায় 'পটভূমি', 'থিরবিজুরি', ও 'অন্তরীপ'। ছাত্রদের পত্রিকা 'ছাড়পত্র,' সমর ঘোষের সম্পাদনায় 'সংবর্ত', প্রসেনজিৎ মল্লিক সম্পাদিত 'অন্বেষা'। দু'তিন সংখ্যার বেশি এ পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয়নি। শুধু ১৯৮৪ থেকে ২০০০ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে সত্য গুহর সম্পাদনায় 'সাহিত্য বাগ্‌দ্রোণী,' এক্ষণে অশোকনগর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে উন্নত জাতের পত্রিকা শুভাশিস চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অহর্নিশ' আর অনির্বাণ দাস, রাতুল চন্দরায় ও অন্যান্যদের সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানে 'বাতিঘর'।

'সহিত' কথাটা থেকে এসেছে সাহিত্য। সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবারে পরিবারে সাহিত্যের অভাব পরিলক্ষিত হলেও আমরা সাধারণ অর্থে যাকে 'সাহিত্য' বলি অর্থাৎ লেখালেখি, তা কিন্তু ছিলো গোড়া থেকেই। আর তার জন্মস্থান হীরালাল রায়ের রায়কেবিন, অনিল দে-র 'অমৃতায়ন,' গোলবাজারের 'বোসের চায়ের দোকান,' ১/৩-এর কানাই ঘোষের চা-মিষ্টির দোকান এবং কালীবাড়ি মোড়ের 'অনিল ঘোষের চায়ের দোকান'। শুধু লেখালেখি নয়, অশোকনগরের প্রায় সমস্ত সাংস্কৃতিক কাজ কারবারের পরিকল্পনার উৎসই ছিলো এসব দোকানে জমানো আড্ডা। একেবারে শুরুর দিকে একজন কবিকে ঘিরে না-লেখক যুবারা মজা করতো। তাকে দেখেই তারা 'রুস্তম রুস্তম' বলে উত্তেজিত করতে চাইতো। তার অপরাধ এক অনুষ্ঠানে সে তার একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলো এবং তাতে রুস্তম আহ্বান ছিলো উদাত্ত কণ্ঠে। তা হোক, এমন আপ্পায়ন জোটে প্রায় সব কবির ভাগ্যেই। তবু কবিতা হয়, কবিতা হয়ে আসে। গদ্যকারদের লেখা যেহেতু ছাপা না হলে খুব একটা জনারণ্যে যায় না, তাই তাদের কবিদের মতো ল্যাঠা সামলাতে হয়না। সাহিত্য রচনা ব্যক্তিগত সামর্থ্যনির্ভর হলেও তার একটা সামাজিক দায় আছে। অশোকনগরের গদ্য-পদ্য লেখকরা সে দায় কখনোই প্রায় অস্বীকার করেন নি। তাঁরা কেবল চাঁদ, তারা, ফুল, নদী এবং বায়োবীয় প্রেমের কারবারী থাকেন নি। অশোকনগরে লেখালেখির চরিত্রই হয়েছে তাই একটু আলাদা। রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনগুলোর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থেকে তাঁরা সাহিত্য করেছেন বলেই তাঁদের সৃষ্টি হয়েছে বলিষ্ঠ। অশোকনগরের গদ্যশিল্পী বাসুদেব দাশগুপ্তের কথা সর্বজনবিদিত। ইন্দুভূষণ দাস, বীরেন্দ্র নিয়োগী লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েই অশোকনগরে এসেছিলেন। সত্য গুহর কথা, তাঁর কাছে কবিতা ও কমিউনিজম সমার্থক। তারাপদ রায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, চন্দন মজুমদার, মুকুল গুহ প্রমুখ কবিরা এক সময়ে তোলপাড় করেছে অশোকনগর, অশোকনগরের কবিরা চিহ্নিত হয়েছে বাংলার কবি হিসেবে। গদ্য লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন জীবন সাহা, কালীকুমার চক্রবর্তী, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ ভট্টাচার্য, অনিতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। নতুন প্রজন্মের কবিদের মধ্যে উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে অনির্বাণ দাস, শুভাশিস চক্রবর্তী, রাতুল চন্দরায়, রাজা ভট্টাচার্য, ডোরা মিত্র, সোমা চক্রবর্তী প্রমুখ। একটা কথা বলা দরকার, এখানে যাঁদের নাম করা হোলো, তাঁরা গদ্য পদ্য দু'মাধ্যমে লেখা লেখিতেই সিদ্ধ হস্ত। কবি সত্য গুহ'র 'একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল'-ই তার প্রমাণ দেয়। তারাপদ রায়, মুকুল গুহ, অনিতা চট্টোপাধ্যায়, অপূর্ব সাহা প্রমুখ যতটা কবি, ঠিক ততটাই গদ্যকার। মূল কথা এ সময়ে গদ্য-পদ্যর ফারাক লোপ পেয়ে গেছে। গদ্যে পদ্যে ভাবাবেগের চেয়ে চিন্তা এবং বোধই হয়ে উঠেছে মুখ্য। শুভাশিস, অনির্বাণ, রাজা, রাতুল, ডোরা — এদের কবিতা-গদ্যকে চিনতে বুঝতে পাঠকদেরও নিজেদের তৈরি হয়ে নিতে হয়। এ 'আশ্রয়' অশোকনগর কবি-গদ্যকার দিয়েছে অনেক। গুণমানে তাদের সৃষ্টি বাংলার বর্তমান, তথাকথিত প্রতিষ্ঠিতদের লেখালেখির সমস্পর্ধী।

আমাদের 'আশ্রয়' অশোকনগর এক্ষণে সমৃদ্ধ। আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তীত। পুরোনো মডেল ভেঙে গেছে। বাড়িঘরের চেহারা বদলে গেছে। বহুবহু যুবা পরিযায়ী পাখি হয়ে উড়ে গেছে বিদেশ-বিভুঁইয়ে। আসছে ডলার। সমস্ত কিছুকে গ্রাস করছে ভোগবাদ। কৃত্রিম হয়ে পড়েছে সবকিছু। তরুণ প্রজন্ম জানেনা 'উদ্বাস্তু' এই শব্দটার মধ্যে নিহিত আছে কত দুঃখ, কত বেদনা, কত লাঞ্ছনা। হয়েওঠার জন্যে, টিকে থাকার জন্যে এই শব্দটির মধ্যে নিহিত আছে কত ক্ষুধা, কত রক্তপাত আর কত চোখের জল। এখনো 'উদ্বাস্তু' এই কথাটি উচ্চারিত হলে অস্তিত্বে ধ্বনিত হয় কু ঝিক্ ঝিক্ — ট্রেন ছুটছে 'ইন্ডিয়া'র কলিকাতার দিকে। তার শব্দ ধর্ষিতার মর্মান্তিক গোঙানি — তার গায়ে রক্তের ছোপ। আর সে যেখানে থামছে, সেখানে ঝড়ে ভাঙাডানা বিপর্যস্ত কাকের মতো থিক থিক করছে মাথা ... মাথা ... মাথা ... আর মাথা...। আর্তনাদ — একটু আশ্রয় ...